ঢাকার চলচ্চিত্রে এ্যাকশন

বিশ্ব চলচ্চিত্র যখন ষাট বছর পার করেছে তখন এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়েছে। প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আবদুল জব্বার খান। ছবির নাম 'মুখ ও মুখোশ'। ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট ছবিটি মুক্তি পায়। শুরুতে ঢাকার ছবিতে শিল্প ধারা বজায় ছিল। এতে প্রথম বাণিজ্যের হাওয়া লাগান এহতেশাম ও মুস্তাফিজ ভ্রাতৃদ্বয়। তারা শিল্প-বাণিজ্যের সহাবস্থানে নির্মাণ করেন 'রাজধানীর বুকে'। ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হলে অনেক লগ্নিকারক এগিয়ে আসেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। বাংলা চলচ্চিত্র পরিণত হয় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে। এ দেশে প্রায় দু'দশক সামাজিক পটভূমিতে ছবি নির্মিত হয়েছে, যেখানে নায়ক-নায়িকা চরিত্রের উপস্থাপন দেখা গেছে সুবোধ তরুণ-তরুণীর। সত্তরের মাঝামাঝি এ ধারার বিপরীতে 'রংবাজ'-এ নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে সমাজের বখাটে শ্রেণীর এক তরুণের। প্রয়াত পরিচালক জহিরুল হক এ চরিত্রে কাস্ট করেন রাজ্জাককে। রাজ্জাকের তখন রোমান্টিক ইমেজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু রংবাজ-এ তিনি অবলীলায় তা ভাঙতে সক্ষম হন।

ছবির কাহিনীতে অনিবার্যভাবে চলে আসে মারপিটের দৃশ্য। তা আসে বখাটেদের শ্রেণীগত চরিত্রের কারণে। মারপিট দৃশ্য পরিচালনা করেন প্রয়াত চিত্রাভিনেতা জসীম। ছবিতে তিনি ছোট্ট একটি চরিত্রে জসীম নামেই অভিনয়ও করেছেন।

'রংবাজ' অসামান্য ব্যবসাসফল হলে এ ধারার ছবি নির্মাণে পুঁজি লগ্নি করতে লগ্নিকারকদের আগ্রহ বেড়ে যায়। কিন্তু তখনকার সামাজিক ছবি নির্মাণে অভ্যস্ত পরিচালকদের বেশিরভাগই এ ধারার ছবি নির্মাণে আগ্রহ দেখান না।

এ ধারায় ছবি নির্মাণে উৎসাহী হন ইবনে মিজান। তিনি ফোক ফ্যান্টাসিকে কাহিনীর উপজীব্য বিষয় করে এ্যাকশন দৃশ্যকে কাজে লাগাতে শুরু করেন। এ সময় তাঁর ছবিতে তলোয়ার যুদ্ধ বেশ প্রাধান্য পায়। যার মধ্যে 'দুই রাজকুমার', 'পাতালপুরীর রাজকন্যা', 'বাহাদুর', 'নিশান' উল্লেখযোগ্য। এ ধারার ছবিতে অভিনয় করে ওয়াসিম ও জাভেদ নায়ক হিসাবে দারুণ জনপ্রিয়তা পান।

ঢাকার চলচ্চিত্রে আধুনিক এ্যাকশন ছবির প্রবর্তনও করেন ইবনে মিজান। এ ধারায় তিনি নির্মাণ করেন 'জিঘাংসা' ও 'এক মুঠো ভাত' ছবি। এ্যাকশন ধারায় নির্মিত প্রতিটি ছবি হিট করলে পরিচালক হিসাবেও তিনি হয়ে ওঠেন জনপ্রিয়।

এ্যাকশন ধারায় আরেকটু গতি আসে দেওয়ান নজরুল পরিচালিত ' দোস্ত দুশমন' ছবিতে। এ ছবিও দারুণ ব্যবসা করে। এর পর দেওয়ান নজরুল পাশ্চাত্য এ্যাকশন ধারায় নির্মাণ করেন 'বারুদ', 'আসামী হাজির' ছবি। এ সময় আরেক নবীন পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন এজে মিন্টু (আব্দুল জলিল মিন্টু)। তাঁর প্রথম ছবি 'মিন্টু আমার নাম' এ্যাকশন ধারায় নির্মিত এবং ব্যবসাসফল।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গোড়াতে ঢাকার চলচ্চিত্রে এ্যাকশনের বড় প্রভাব ছিল হিন্দী চলচ্চিত্রের । ইবনে মিজান 'এক মুঠো ভাত' নির্মাণ করেছেন হিন্দী 'রোটি' ছবির কাহিনী নিয়ে। 'দোস্ত দুশমন' তৈরি হয়েছে 'সোলে' এবং 'মিন্টু আমার নাম' হয়েছে 'জনি মেরা নাম' থেকে। এসব ছবির এ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করেছেন জসীম। খল চরিত্রেও তিনি তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। আশির দশকে ঢাকার এ্যাকশন ছবিতে মার্শাল আর্টের ব্যবহার শুরু হয়। এটি শুরু হয় হংকংভিত্তিক ছবির প্রভাবে। মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানার ভাই রুবেল এ ধারার প্রবর্তক। তাঁর 'দি এ্যাকশন ওয়ারিয়রস' প্রথম ঢাকার চলচ্চিত্রে মার্শাল আর্টের ব্যবহার শুরু করে। এ ধারার ছবি মুক্তির পর দেশের আনাচে-কানাচে মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। যদিও মার্শাল আর্টের মূলমন্ত্র আত্মরক্ষা, কিন্তু এ শিল্পের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমাজজীবনে। প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকে মার্শাল আর্টকে ব্যবহার করতে শুরু করে সন্ত্রাসী তৎপরতায়। যদিও ঢাকার চলচ্চিত্রে এখন হংকং ও হলিউডভিত্তিক এ্যাকশন ধারার মিশেল দেখা যাচ্ছে। নির্মাতারা বাণিজ্যিক সাফল্যের আশায় একটি ছবির ব্যাপ্তিকালকে তিন ভাগে ভাগ করছেন। এক. গল্প, দুই. নাচ-গান, এবং তিন. এ্যাকশন। এ তিন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা ছবির নামকরণ করছেন। যে ছবিতে নাচ গান ও এ্যাকশন কম তাকে বলছেন সামাজিক। গল্প ও এ্যাকশনের মিশেলকে বলছেন 'সোশ্যাল এ্যাকশন' ছবি। শুধু নাচ ও অশ্লীলতায় ভরপুর ছবির বাণিজ্যিক নাম তাঁরা দেননি।

চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস

ঢাকার চলচ্চিত্রে এখন সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে বীভৎসতা। ঘাড় মটকে ফেলা, হাত-পা ভেঙ্গে বা কেটে ফেলা, মানুষের কলজে উপড়ে কাঁচা চিবিয়ে খাওয়া, হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্যের উপস্থাপন এখন নিয়মিত এবং প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। কে কতটা বীভৎস দৃশ্য পর্দায় তুলে ধরতে পারেন, তা নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়েছে। সমাজজীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। অবশ্য মাথা তাদের আদৌ আছে কিনা তা নিয়েও অনেকে সন্দিহান। মাথা থাকলে মাথাব্যথা থাকত। ব্যথা থাকলে শিল্পের প্রতি দায়বোধ থাকত। থাকত সমাজের প্রতিও। এখনকার অনেক নির্মাতার মুখে এমন কথাও শোনা যায় যে, তাঁরা সমাজের অস্থিরতাকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরছেন। প্রশ্ন হল সমাজে তো ভাল ঘটনাও ঘটছে, সেগুলো তাঁরা তুলে ধরছেন না কেন? কেন সন্ত্রাসকে বাণিজ্যের পুঁজি করা হচ্ছে বার বার? যেখানে সন্ত্রাসের নানা কৌশল তুলে ধরা হচ্ছে। কেনইবা বীভৎসতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা শুরু করা হচ্ছে?

সুস্থ ধারার নির্মাতারা মনে করছেন, এর দায়ভার অসুস্থ নির্মাতাদের নয়, অসুস্থ সেন্সর বোর্ডের। সমাজে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে এমন ছবি সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র না দিলেই তো এ ধরনের ছবি নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে সেন্সর বোর্ড বলছে, তাদের কাছে চলচ্চিত্রের যে 'রাশ' জমা দেয়া হয় তাতে নগ্ন বা বীভৎস দৃশ্য থাকে না। কিন্তু এ জন্য তো মাঠপর্যায়ে সরকারের পরিদর্শক দল রয়েছে। তাদের ভূমিকা কী? চলচ্চিত্রে কাটপিস, বীভৎস দৃশ্যের সংযোজন যখন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করার করার অভিযোগ উঠছে এবং তা বার বার, তখন তারা নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে কেন?

অনেকের মতে, গোটা চলচ্চিত্র শিল্প এখন অসাধু ব্যক্তিবর্গে পরিবেষ্টিত। সেন্সর বোর্ড আবৃত হলুদ খাসে। কারণ ঢাকার চলচ্চিত্রে অবক্ষয় একদিনে আসেনি। এসেছে ধাপে ধাপে। চলচ্চিত্রের এ অসুস্থ ধারায় হাত গুটিয়ে নিয়েছেন অনেক মেধাবী পরিচালক। তাদের কেউ কেউ এখন প্যাকেজ নাটক তৈরি করে শিল্পের ক্ষুধা মেটাচ্ছেন। বর্তমানে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশিরভাগই অসুস্থ এবং বিকৃত মানসিকতার। গোটা চলচ্চিত্র এদের কাছেই জিম্মি। এঁদের কাছে শিল্প হচ্ছে পুঁথিগত শব্দ। তাঁরা বোঝেন বাণিজ্য। তাই কখনও যৌনপ্রিয়, কখনও সন্ত্রাসপ্রিয় হয়ে উঠছেন। নিজেরাই ঠিক করতে পারছেন না, হাল ধরবেন, না জাল ফেলবেন।

ঢাকার এ্যাকশন চলচ্চিত্রে বীভৎসতা বেড়েছে বছরপাঁচেক হলো। পর্দায় এর উপস্থাপনরীতিও আতঙ্কজনক। যে কোন দুর্বলচিত্তের মানুষ হলে বসে এ দৃশ্য দেখে মারা যেতে পারেন, এমনটি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়! চলচ্চিত্রে বীভৎসতা যে হারে বাড়ছে তাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। কিন্তু এর দায়দায়িত্ব কে নেবে? নির্মাতা, নাকি সেন্সর বোর্ড? অথচ চলচ্চিত্রে এখনও কোন গ্রেডেশন হয়নি। হলিউড পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও সমাজের প্রতি কিছুটা হলেও দায় বোধ করছে। তারা গ্রেডেশনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন ছবি কোন ধরনের দর্শকদের জন্য? বাংলাদেশে এর কোন বালাই নেই। অবশ্য সম্প্রতি ‘ফায়ার’ নামে একটি গ্রেডেশনের ভিত্তিতে মুক্তি দেয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। সেখানে ‘প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য’ কথাটা লেখা থাকবে। এটি যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই। তাহলে তিনি এ ধারার ছবিই নির্মাণ করতেন না। যা করা হচ্ছে তা ব্যবসায়িক ফায়দা লুটতে। কারণ ‘ফায়ার’ কে ঘিরে ইতোমধ্যে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। গ্রেডেশনে ফেলে তাকে হলে ছাড়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে মাত্র। অথচ এ্যাকশন চলচ্চিত্র নিয়ে এখন পর্যন্ত গ্রেডেশনের দাবি ওঠেনি। গোটা বিশ্বে হরর ছবিগুলো আলাদা গ্রেডেশনে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। এ্যাকশন ছবির অর্থ তাদের কাছে ভিন্ন। কিন্তু বাংলাদেশে এ্যাকশন ও হরর একাকার হয়ে আছে। এ জন্য গ্রেডেশেন জরুরী। হাত কেটে ফেলার দৃশ্য ‘দোস্ত দুশমন’-এও ছিল। কিন্তু তার উপস্থাপনরীতিতে বীভৎসতা ছিল না। দর্শকদের ভয় দেখানোও এ ছবির লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল বিষয়টি বোঝানো। কিন্তু এখনকার এ্যাকশন ছবিতে দর্শকদের ভয় দেখানোই যেন লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এ ধরনের দৃশ্য কি কারও কাম্য হতে পারে? বিভিন্ন বয়সের দর্শক চলচ্চিত্র দেখেন। বীভৎস দৃশ্য তাঁদের স্নায়ুতে ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। চলচ্চিত্রে ভয়াবহ দৃশ্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে কাজী হায়াতের ছবি ‘দাঙ্গা’র মাধ্যমে। কারণ সমাজের সন্ত্রাস, রাজনৈতিক ব্যাভিচার ইত্যাদিকে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের উপজীব্য বিষয় করে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। রাজনৈতিক ছবি বলেও তাঁর ছবির পক্ষে অনেক প্রচারণা চালানো হয়েছে। কিন্তু ‘জীবন থেকে নেয়া’-র মতো ঢাকায় আদৌ কোন রাজনৈতিক ছবি নির্মিত হয়েছে কি?

কাজী হায়াতের ছবিতেই প্রথম খল নায়কের উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। রাজীব ও ডিপজল খলনায়ক তথা চলচ্চিত্রের ভয়ঙ্কর মানুষ হিসাবে পরিচিতি পায়। শহীদুল ইসলাম খোকনের ছবিতে হুমায়ুন ফরীদি। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠেন খলনায়কেরা। তাঁরা বিভিন্ন ছবিতে বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করছেন অবলীলায় (অবশ্য তাঁরা করছেন নির্মাতাদের চাহিদা পূরণ করতে), যা গ্রহণযোগ্য নয়।

চলচ্চিত্রে এ্যাকশন দৃশ্যের পথিকৃৎ ছিলেন জসীম। তাঁর জ্যাম্বস গ্রুপ দীর্ঘদিন চলচ্চিত্রে এ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ্যাকশন দৃশ্যকে শিল্পে উত্তীর্ণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের এ্যাকশন দৃশ্যের পরিচালকরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

এখন যাঁরা এ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করছেন তাঁদের মধ্যে ‘দি এ্যাকশন ওয়ারিয়রস’, ‘মুসলিম ফাইটিং গ্রুপ’, ‘আরমান’-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের হাতেই কমবেশি পরিচালিত হচ্ছে ছবির এ্যাকশন দৃশ্যগুলো। তারা কি চলচ্চিত্রে সোহেল রানা, ওয়াসিমের মতো এ্যাকশন হিরোর জন্ম দিতে পেরেছে। প্রয়াত জসীমের এ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনায় ঢাকার চলচ্চিত্রে এ দু'জন নায়ক ‘এ্যাকশন কিং’ হতে পেরেছিলেন, যাঁদের ইমেজ এখনকার কোন নায়ক ভাঙতে পারেননি। পাশাপাশি সামাজিক ঘরানার ছবি থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল এ্যাকশন ছবিতে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে পেরেছেন। তাঁর এ উন্মেষ ঘটে মমতাজ আলীর ছবিতে। সেসব ছবিতে এ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করেছেন জসীম।

গোটা বিশ্বেই চলচ্চিত্র শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে পরিচিত এবং নন্দিত। সমাজজীবনে এর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা অসম্ভব। এক সময় এই প্রভাবশালী মাধ্যমে ঢাকার নায়করা ছিলেন মেধাবী ছাত্র, আদর্শবান। নায়িকারা তাদের আদর্শগুণে প্রেমে পড়তেন। ফলে, সমাজজীবনে বাস্তব হিরোদেরও প্রবণতা ছিল প্রেমের উৎস হিসাবে নিজেদের মেধাবী ও আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার। কিন্তু এখনকার চলচ্চিত্রের নায়করা মস্তান, পেশীবাজ, অস্ত্রধারী, বোমাবাজ তাঁরা পেশীর জোরে ভিলেনের হাত থেকে নায়িকাদের উদ্ধার করে নায়িকার মন যোগান। এ ধরনের চলচ্চিত্র সমাজকে কী শিক্ষা দিয়েছে। তা এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উদাহরণ পাওয়া যায় গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে বখাটেদের দৌরাত্ম্যে। বল প্রয়োগে প্রেম নিবেদন, এ্যাসিড নিক্ষেপ, শিক্ষায় অনীহা, মস্তানি, চাঁদাবাজি– এসব এখন সমাজজীবনে তরুণীদের প্রাত্যহিক কর্ম হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের এ্যাকশন চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত এদেশের এ্যাকশন চলচ্চিত্র নির্মাতারা কি এ দায় এড়াতে পারবেন?